স্মরণ

প্রতিমা দেবী : রবীন্দ্রনাথের ‘ব্রাইড-মাদার’

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ অমিয়া দেবী তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে লিখেছেন, ‘‘প্রতিমা দেবীর নিকট শুনি—তাঁর তিন-চার বৎসর বয়সের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী তাঁর চেহারায় মুগ্ধ হয়ে বলতেন, ‘এই সুন্দর মেয়েটিকে আমি পুত্রবধূ করব। আশা করি ছোট্‌দিদি—গুণেন্দ্রনাথের স্ত্রী—তাঁর নাতনীটিকে আমায় দেবেন।’ কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থেকে গেল তাঁর অকাল বিয়োগে।’’[১]

কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর আকাঙ্ক্ষিতা, রূপে গুণে অনন্যা প্রতিমা দেবীর জন্ম হয়েছিল ৫ নভেম্বর (২০ কার্তিক) ১৮৯৩ সালে। এক অদ্ভুত যোগসূত্র নিয়ে এসেছিলেন তিনি। তিনি ঠাকুরবাড়িরই মেয়ে, আবার ঠাকুরবাড়িরই বউ। পাঁচ নম্বর আর ছয় নম্বর বাড়ি। যারা কাছেই ছিল তাদের আরও কাছে এনে দিয়েছিলেন। প্রতিমা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী। ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন বৈঠকখানা বাড়িতে জন্ম হয়েছিল তাঁর। পিতা ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা গুণেন্দ্রনাথের কন্যা বিনয়িনী। বাড়ির প্রথা মেনে পিতা ছিলেন ঘরজামাই, তাই তাঁর ছেলেবেলা কেটেছিল মামার বাড়িতে, যে শৈশবস্মৃতির ছবি তিনি ‘স্মৃতিচিত্র’তে এঁকেছেন। ঠাকুরবাড়ির দুটি গৃহ পাশাপাশি হলেও তাদের মধ্যে প্রভেদ ছিল যথেষ্ট। পাঁচ নম্বর বাড়িটিতে সাবেকি হিন্দু রীতিনীতি ও পূজা-অর্চনার রেওয়াজ ছিল পূর্ণ মাত্রায়—যে-কথার আভাস মেলে প্রতিমা দেবীর মা বিনয়িনী দেবীর লেখনী থেকে। তিনি তাঁর মৃত্যুর কিছু বছর আগে, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে, ‘কাহিনী’ নামে একটি আত্মজীবনী লেখেন। মহর্ষিভবনে আত্মকথা লেখার একটা প্রবণতা ও রীতি ছিল। নিয়মিত লেখাপড়ার চর্চা না থাকলেও বিনয়িনী দেবীর লেখার হাতটি ছিল সহজ, সুন্দর ও অনাবিল। আরও একটি বিশেষ গুণ ছিল তাঁর। শিল্পী-হাতের স্পর্শ ছিল তাঁর আঙুলে। তিনি সুন্দর খোঁপা বাঁধতে পারতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা সকলে বিকেলে গা ধুয়ে সুন্দর শাড়ি পরতেন, খোঁপা বাঁধতেন। কেশবিন্যাসে সকলকে সাজিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বিনয়িনী। জন্মসূত্রে এ-সমস্ত গুণই পেয়েছিলেন প্রতিমা দেবী। হয়ে উঠেছিলেন অজস্র বিরল গুণের অধিকারিণী।

ছোট্ট প্রতিমাকে ছেলের বউ করে আনার ইচ্ছা

প্রকাশের পর মৃণালিনী দেবীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে এ-বিবাহে তাঁরও পূর্ণ অনুমোদন ছিল, কিন্তু তখনও রথীন্দ্রনাথের পড়াশোনা শেষ হয়নি বলে তিনি তাৎক্ষণিক বিবাহে 'সুস্পষ্ট অসম্মতি' প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেযুগের হিন্দু রীতি মেনে চলা প্রতিমার অভিভাবকদের পক্ষে অপেক্ষা করা ছিল দুষ্কর। তাই মনে হয় তাঁরা রথীন্দ্রনাথের আশা ত্যাগ করেন ও অতি অল্প বয়সেই প্রতিমার বিয়ে হয়ে যায় গুণেন্দ্রের ছোট বোন কুমুদিনীর ছোট নাতি নীলানাথের সঙ্গে। গগনেন্দ্রনাথের কন্যা পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''বিয়ের সময় প্রতিমাদিদির বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। আমার ঠিক মনে নেই, বোধহয় বাংলা ১৩১০ সালের মাঝামাঝি প্রতিমাদিদির ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ ছিল।''[২] ১৯০৪ সালে প্রতিমার বিয়ে হয়। কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যেই গঙ্গায় ডুবে তাঁর প্রথম পক্ষের স্বামী নীলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। ফাল্গুন মাসে বিয়ে হল, বৈশাখ মাসে শুভদিন দেখে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হল ও তার কয়েকদিনের মধ্যেই গঙ্গায় সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল নীলানাথের। 'অপয়া' অপবাদ নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এলেন বালিকা প্রতিমা।

বিনয়িনী দেবী

এ-ঘটনার পাঁচ বছর পর ১৯০৯ সালের শেষে রথীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিবাহপ্রসঙ্গে প্রথমেই প্রতিমা দেবীর কথা ভাবেন। তখন এমনিতেই বাল্যবিধবাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কথা স্মরণ করে কবির মনের মধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার আসছিল। পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়ে তিনি সেই ইচ্ছাকে সার্থক করতে চাইলেন। গগনেন্দ্র-কন্যা পূর্ণিমা লিখছেন, ''...রথিকাকা বিলেত থেকে ফিরে এলে রবিদাদা... বাবাকে বললেন, 'তোমাদের উচিত প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়া। বিনয়িনীকে বল যেন অমত না করে। ওর জীবনে কিছুই হল না। এ বয়সে চারিদিকের প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা মুসকিল। এখন না হয় মা বাপের কাছে আছে। এর পরে ভাইদের সংসারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে সেটাই কি তোমাদের কাম্য? না বিয়ে দেওয়া ভাল, সেটা বুঝে দেখ।' ''[৩]

অতএব গগনেন্দ্রনাথ তাঁর বোন বিনয়িনী দেবীকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করালেন ও নিজে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিমা দেবীও প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। পরে মামার অনেক বোঝানোতে মত দিলেন। পূর্ণিমা লিখছেন, ''সমাজকে অগ্রাহ্য করে নিজের বাড়ি থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজের বাধা অনেক এসেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না।''[৪] ১৪ মাঘ, ১৩১৬ (২৭ জানুয়ারি ১৯১০, বৃহস্পতিবার) রাত্রি ৯টার সময় রথীন্দ্রনাথ

(বয়স ২১) ও প্রতিমা দেবীর (বয়স ১৬) বিবাহ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ডায়রিতে লেখেন : ''রথীর বিবাহ হয়ে গেছে... প্রতিমা (কনে) মেয়েটি বেশ দেখতে—বয়স ১৬। আমাদের বাড়িতে এই প্রথম বিধবা বিবাহ। গগনদের বাড়িতে বিবাহ।''[৫] দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথ ওই তারিখ দিয়েই ছেলেকে 'গোরা' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। কবির বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুও ওই একই তারিখ দিয়ে তাঁর 'Plant Response as a means of Physiological Investigation' বইটির একটি কপি রথীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। রবীন্দ্র-পরিবারে গৃহলক্ষ্মীরূপে পা রাখেন প্রতিমা। চিত্রা দেব-এর মতে ''তিনি ছিলেন 'মূর্তিমতী লক্ষ্মীশ্রী', রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের 'মা-মণি', তাঁর আদরের 'ব্রাইড মাদার' (বৌমা)। দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে তাঁর সেবা করে গিয়েছেন প্রতিমা। সেই সঙ্গে চলেছে আশ্রমের দেখাশোনা আর অতিথিসেবার কাজ। কবির সেবা করা খুব সহজ কাজ ছিল না। প্রতিমা করেছেন অসীম ধৈর্য নিয়ে।''[৬]

প্রতিমা দেবী শুধুমাত্র সুন্দরী ছিলেন না, ছিলেন অনন্য গুণবতী। দুই পরিবারের শিক্ষা-সংস্কৃতি ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর কল্যাণশ্রী রূপের মধ্যে ছিল এক আশ্চর্য নিরাসক্ত সৌন্দর্য, যা স্বাভাবিকভাবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপ ও স্বভাবে বড়ই প্রীত হলেন। স্ত্রীর অকাল বিয়োগের পর বহুদিন বাদে সংসারে যেন এক আশ্রয় খুঁজে পেলেন। তাই বিস্ময়কর হলেও ঠাকুরবাড়ির ক্যাশবই থেকে দেখা যায় যে বিবাহের সাত দিনের মধ্যেই তিনি পুত্রবধূকে সংসার খরচ বাবদ টাকা দিয়ে গৃহিণীপনার দায়িত্ব দান করেছেন। সেইদিনই তিনি জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখছেন, ''...বৌমার সংবাদ বোধহয় এতদিন নানা স্থান থেকে পেয়েছ। সকলেরই তাকে খুব ভাল লেগেছে। শান্তি তো একেবারে মুগ্ধ ধীরেনেরও সেই দশা। ওরা বেলাকে বারবার করে বলেছে যে এবার বৌয়ের রূপের কাছে বেলাকেও নিষ্প্রভ করে তুলেছে। শুধু রূপ নয় বৌমার ভাবখানিও বড় মিষ্ট। মুখে সর্বদাই এমন একটি শান্ত ধীর সুপ্রসন্ন ভাব লেগে রয়েছে যে, যে তাকে দেখে সকলেই আকৃষ্ট হয়।''[৭]

অপরদিকে প্রতিমাদেবী তাঁর প্রথম শ্বশুরবাড়ি আগমনের স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছেন, ''... পরদিন ১৫ মাঘ শ্বশুরবাড়ি এলুম। বাড়ির বদলে বেশী কিছু তফাত মনে হল না, কিন্তু ভাবের বদল মনে হয় অনেকখানি। কেননা আমার মামার বাড়ি ও বাপের বাড়ি তখনও হিন্দু সমাজভুক্ত। তাঁদের আদব কায়দা দস্তুর, জীবনযাত্রার প্রণালী সবই সনাতনপন্থীদের মত, শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং নবযুগের আভাস পাওয়া যায়।''[৮]

কিন্তু আপাতবিরোধী এই পরিবেশে এসে নিজেকে সর্ব অর্থে তার অনুকূল করে তুললেন প্রতিমা। হয়ে উঠলেন বিশ্ববরেণ্য শ্বশুরমশাই রবীন্দ্রনাথের মনের মতন। বিবাহের কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁদের দুজনকে নিয়ে চলে এলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর একান্ত প্রিয় শান্তিনিকেতনে। নবদম্পতিকে সংবর্ধিত করলেন আশ্রমের মানুষজনেরা। সেখানে আসার পরও রবীন্দ্রনাথ সংসার ও জমিদারির ভার তুলে দিতে লাগলেন পুত্রবধূ ও পুত্রের হাতে। জীবনের অপরাহ্নে অমিয়া ঠাকুরের কাছে স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি সেকথাই স্মরণ করেছেন : ''ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম একটি আনাড়ি মেয়ে, কিছুই জানি না। আমার শিক্ষাদীক্ষা যা-কিছু সব আমার স্বামী এবং শ্বশুরের কৃতিত্ব। তাঁরাই আমাকে শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন চালিয়েছেন। প্রতিনিয়তই তাঁদের আমি শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। যখন প্রথম এখানে

এলাম বাবামশাই শিশু-বিভাগের কুড়ি-পঁচিশটি ছোটো ছোটো ছেলে ও আশ্রমের অন্যান্য সকলকে দেখিয়ে বললেন, 'বৌমা, এই সব নিয়েই তোমার সংসার।' শৈশব থেকেই আমিও তাই বুঝেছি।"[৯]

আক্ষরিক অর্থে তাই সত্যি। ঠাকুর পরিবারের অঙ্গ হলেও প্রতিমা দেবীর বাপের বাড়িতে প্রাচীন রীতি মেনে মেয়েদের পড়াশোনার কোনও চল ছিল না, সেকথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। অতএব অপেক্ষা না করে তিনি অবিলম্বে পুত্রবধূকে সাক্ষর করে তুলতে যত্নশীল হলেন। তাঁর অন্যান্য সন্তানদের মতন প্রতিমা দেবীর জন্যও সন্ধান করতে লাগলেন ইংরেজ অথবা আমেরিকান গভর্নেস—যিনি তাঁর সঙ্গে থেকে আদবকায়দা শেখাবেন, সংসারযাত্রা সম্পর্কে অবহিত করবেন, ইংরেজি ভাষাও শেখাবেন। সেই আগ্রহে তিনি রথীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে জমিদারি দেখার কাজে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা দেবী ও মীরা দেবীকেও সেখানে পাঠিয়ে দিলেন আর তাঁদের সঙ্গিনী ও শিক্ষয়িত্রী হয়ে আমেরিকা থেকে এলেন মিস বুর্ডেট। এঁকে সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন মীরা দেবীর আমেরিকা-প্রবাসী স্বামী নগেন্দ্রনাথ। এইসময় দূর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে যেসব চিঠি লেখেন সেগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি পুত্রবধূর জন্য কী ধরনের শিক্ষা ও তালিম চাইছেন। প্রতিমা দেবীকে তিনি লিখছেন, ''মিস্ বুর্ডেটকে ত শুধু ভাল লাগ্‌লে হবে না তাঁকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি যদি শেলাই জানেন হয় তাহলে তাঁর কাছ থেকে ভাল করে শেলাই শিখে নিয়ো—কেবল সৌখীন শেলাই নয়—জামা কাপড় প্রভৃতি কাট্‌তে শেখা চাই। শেলাই শেখা উপলক্ষ্যে খানিকটা ইংরাজি কথা কওয়ার অভ্যাস সুরু হবে।... আমি যখন যাব তখন দেখব তোমাদের খুব ইংরিজি কথা হুহুঃ শব্দে চলছে।..."[১০]

অতি ব্যস্ততার জীবনে যেখানে যেভাবেই থাকুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের বড় অংশকে অধিকার করে রেখেছে পুত্রবধূর শিক্ষা-দীক্ষা। নিজে কাছে থাকলে নিজেও পড়াতেন। আর দূরে থাকলে ভার দিয়ে যেতেন নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের ওপর। ২৩ আষাঢ় (৭ জুলাই ১৯১০) শিলাইদহ থেকে প্রতিমা দেবীকে তিনি এক পত্রে লিখছেন, ''... কিন্তু তোমার পড়ার পাছে ব্যাঘাত হয় এই উদ্বেগ আমার মনে আছে। তোমাকে পড়াবার জন্য অজিতকে বলে এসেছিলুম সেইমত তোমার পড়া চল্‌চে ত? ইংরেজি পাঠ প্রথম ভাগ ত হয়ে গেছে—আর একটা বই তোমার জন্য ঠিক করে দিয়েছিলুম সেটা বেশ বুঝতে পারচ ত? সে বইটা ইংরেজি পাঠের চেয়ে ভারী নয় বরঞ্চ হালকা।

হেমলতার কাছ থেকে বাংলা গদ্য ও পদ্য কিছু কিছু পড়ে যেয়ো। বানানটা যাতে ক্রমে বিশুদ্ধ হয় সেই চেষ্টা কোরো।"[১১]

এইভাবে নানা স্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কন্যাদের ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে নানান শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রেখে তাঁদের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টাকে পূর্ণরূপে সার্থক করে তুলেছিলেন প্রতিমা দেবী। সর্বতোভাবে হয়ে উঠেছিলেন গুরুদেবের প্রাণের শান্তিনিকেতনের এক অভিন্ন অঙ্গ। ক্রমে তাঁর গুণের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাঁকে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাদান করেই ক্ষান্ত হন না তাঁর বাবামশাই, তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যান ইউরোপ আমেরিকা যাত্রায়। সেখানে উন্নত পশ্চিমি দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল করান। অভ্যস্ত করান ভিনদেশি জীবনযাত্রার সঙ্গে। প্রতিমা দেবী তাঁর প্রৌঢ়, শোকতাপিত ও সৃষ্টির কাজে আত্মমগ্ন থাকতে উন্মুখ ক্ষণজন্মা শ্বশুরের অধিকাংশ মনোবাঞ্ছাই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এপ্রসঙ্গে একবার ইউরোপ যাওয়ার পথে আরব

সমুদ্রে জাহাজ থেকে কন্যা মীরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন (৩১ মে ১৯১২তে), ''বৌমা বেশ কাটিয়ে দিচ্চেন। ওঁর ভাবটি বেশ নিঃসংকোচ। নতুন জায়গায় নতুন পথে নতুন লোকদের মধ্যে দিয়ে যাচ্চেন বলে কোথাও যে কিছুমাত্র সংকোচ আছে দেখচিনে।...''[১২] সত্যি, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষা-সৌষ্ঠবের সঙ্গে শীঘ্রই একাত্ম হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রতিমা দেবী। হয়ে উঠেছিলেন সব অর্থেই তাঁর মনের মতন।

প্রতিমা দেবী

এইভাবে বাবামশাই ও স্বামীর সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে তাঁর আরও বেশ কিছু শিক্ষা হয়েছিল, যার ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কখনও রবীন্দ্রগুণমুগ্ধ গুণীজনেরা এদেশে এলে তাঁদের কাছে কিছু শিখেছেন তো কখনও তালিম পেয়েছেন বিদেশে—বিশিষ্ট কোনও শিল্পীর কাছে। এমনই একজন ছিলেন জাপানের কাম্পো আরাই (১৮৭৪-১৯৪৫)। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'-র কাজে যোগ দেওয়ার আগ্রহে তাঁর বন্ধু শিল্পী নাম্পু কাতায়ামাকে সঙ্গে নিয়ে ১৩ নভেম্বর ১৯১৬ টোকিও থেকে রওনা হয়ে ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় এসে পৌঁছন। অ্যান্ডরুজ ও রথীন্দ্রনাথ তাঁকে জোড়াসাঁকোতে নিয়ে আসেন। তার কয়েকদিন পরই তাঁরা পৌষ উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে যান। ২৯ ডিসেম্বর থেকে তিনি জাপানি পদ্ধতিতে ছবি-আঁকা শেখানোর কাজ আরম্ভ করলে প্রাথমিক ছাত্ররূপে যোগদান করেন প্রতিমা দেবী, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ। ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শিল্পাঙ্গনে এ-হেন অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে প্রতিমা দেবী তাঁর মাতৃকুলের গগন ঠাকুর-অবন ঠাকুরের পরিবারের নাম জয়যুক্ত করেছেন। করেছেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত স্নেহময় বাবামশাইয়ের মুখ উজ্জ্বল!

বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরেছেন প্রতিমা দেবী রথীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এমনই এক সফরে রবীন্দ্রনাথ লন্ডন থেকে আমেরিকার পথে যাত্রা করলে রথীন্দ্রনাথকে লন্ডনেই থেকে যেতে হয়, প্রতিমা দেবীর অপারেশনের জন্য। সেখানে তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁরা প্যারিসে চলে যান ও আঁদ্রে কার্পেলসের বাড়ির কাছে, তাঁরই ঠিক করে দেওয়া একটি বোর্ডিং হাউসে ওঠেন। এই সময়টি তাঁকে শিল্পজগতের কিছু নতুন বিদ্যা শেখার সুযোগ করে দেয়। Mon. Menhot তাঁকে সেরামিক পেন্টিং ও জাভাদেশীয় বাটিকের কাজ শেখান ও Mon. Piot-এর কাছে তিনি তালিম পান ফ্রেস্কো আঁকার পদ্ধতির। ভাবতে ভাল লাগে, যে-বাটিক, সেরামিক ও ফ্রেস্কোজাতীয় কাজের জন্য বিশ্বভারতীর কলাভবন ও

শান্তিনিকেতন আজ জগৎবিখ্যাত, সেই অনন্য শিল্পের অবতারণা হয়েছিল প্রতিমা দেবীর হাত দিয়ে!

চিত্রশিল্পী ও বিভিন্ন কারুকলায় পারদর্শিনী আঁদ্রে একবার এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর অল্পদিনের বসবাসে লাভবান হয়েছিল কলাভবন। তাঁর চেষ্টাতেই কলাভবনের 'বিচিত্রা' নামক কারুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সে থাকার সময় এঁরই উৎসাহে প্রতিমা দেবী পটারির কাজ শিখেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে কলাভবনে সেই কাজের সূচনা ঘটে। এঁর বিদায়কালে এঁকে সংবর্ধিত করতেই রবীন্দ্রনাথ 'ভরা থাক স্মৃতিসুধায়...' গানটি রচনা করেছিলেন, যেটি সেদিন গাওয়া হয়েছিল। আঁদ্রে প্রসঙ্গে ১১ বৈশাখ ১৩৩০ আনন্দবাজারে যে-প্রতিবেদনটি বেরিয়েছিল, সেটি এইরকম—

''কুমারী আঁন্দ্রে কাপ্লে ফরাসী দেশীয় চিত্রশিল্পী। আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী ইঁহারই সাহায্যে বাঙ্গলা দেশের নারীগণের উন্নতির জন্য একটি শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারী কাপ্লে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া আমাদের দেশের কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চারুশিল্পের প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইনি আশ্রমের শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের কাঠের কারিগর, মাটির কারিগর ও গালার কারিগরদের লইয়া আধুনিক সময়োপযোগী করিয়া ভারতের পুরাতন ঐ সমস্ত নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। কাপড়ের উপর কাজ করা আমাদের দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ—এই দিকেও শিল্পীদের লইয়া তাঁহারা অনেক উন্নতি বিধান করিতেছেন।...''[১৩]

এইভাবে প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় শুধুমাত্র দেশ-বিদেশের শিল্পকলায় সমৃদ্ধি লাভই করলেন না, উপরন্তু হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার সুদক্ষ সমালোচক। পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুহাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন। ছবি হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে 'শেষ বয়সের প্রিয়া'। সহজ দৃষ্টিতে সেসব ছবির ব্যাখ্যা চলে না। প্রতিমা দেবীর কথায়, ''দিব্যদৃষ্টি দিয়ে কেউ যদি সে জিনিস ধরতে পারল তো বুঝল, নইলে খনির ভিতর মণির মতো তার দীপ্তি রইল ঢাকা।''[১৪] রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের সেইসব দুরূহ চিন্তা ও কল্পনার মায়াজালকে প্রাণদান করেছেন প্রতিমা দেবী, তাঁর লেখা 'গুরুদেবের ছবি' প্রবন্ধে। করেছেন রবীন্দ্রনাথের ছবির সুন্দর বিশ্লেষণ! রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তিনভাগে ভাগ করে প্রতিমা দেখিয়েছেন যে তাঁর আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবজন্তু যেমন ফরাসিদের আকৃষ্ট করেছিল তেমনি মানুষের মুখের প্রতিকৃতি মুগ্ধ করেছিল জার্মানদের। এসব ছবিকে বোঝানো সত্যিই কঠিন। কল্পলোকে বিলীন কবির জীবনসায়াহ্নে একান্তে যে-বর্ণময় জগৎ ধরা দিয়েছিল, তাকেই রঙে তুলিতে রূপদান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চিরদিন বাবামশাই-এর পাশে পাশে থাকা অনুভূতিশীলা মেধাবিনী পুত্রবধূর কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার অর্থ! তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যেমন একটি সৃষ্টির সম্পূর্ণ চেহারা দিয়েছেন, চিত্রেও তেমনি এঁকেছেন বস্তুপ্রবাহের আবর্তনের ইতিহাস। তাঁর কথায়, ''গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে যে ঘূর্ণায়মান গতি তেজের চাপে রচনার কাজে নিরন্তর নিযুক্ত, তারই জোয়ার ভাঁটার টানে রেখা হতে রেখান্তরে প্রাণী ও জড়জগতের চেহারা ছাঁচে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসছে। শিল্পীর মনে লেগেছিল সেই স্রোতের ঢেউ। ব্যক্তিত্বের রসে মজে তাই তুলির টানে বেরিয়ে এল রূপ হতে রূপান্তরে সৃজিত অপরূপ মানুষ পশুপক্ষী ও দৃশ্য।''[১৫]

প্রতিমা দেবী নিজেও খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন। এ-ক্ষমতাটি ছিল তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া। তার ওপর

কিছু তালিমও পেয়েছিলেন ইতালিয়ান শিক্ষক গিলহার্ডির কাছে। সমস্ত বিষয়ে তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর স্নেহপ্রবণ বাবামশাই—বন্ধুর মতো, শিক্ষকের মতো। ১ আগস্ট ১৯২৮ রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে একটি চিঠিতে লিখছেন, ''...বিচিত্রার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি। তোমার boudoir-এ আমার লেখবার ঘর। কল্পনা করে দেখ যেখানে বসে তুমি ছবি আঁকতে সেই ঘরে বসে আমি লিখচি। তোমার টুকিটাকি অসংখ্য জিনিসের মধ্যে একটা কিছু যদি হারায় আমাকে যেন দোষ দিয়ো না, আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিইনে, নিজের কাজেই ব্যস্ত।...''[১৬]

ছবি আঁকার পাশে পাশে প্রতিমা দেবীর লেখার হাতটিও ছিল মধুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছদ্মনাম দিয়েছিলেন 'কল্পিতা দেবী।' সেই নামে তিনি বহু লেখা লিখতেন। 'প্রবাসী'-তে বের হয়েছিল তাঁর অনেক কবিতা। প্রতিটি কবিতা লিখেই তিনি বাবামশাইকে দেখাতেন। আসতেন ভীত পদক্ষেপে—বিশ্বকবির কাছে। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগ সহকারে সেগুলিকে মার্জিত করে উন্নত করতেন। কখনও আবার ভেঙেচুরে সেটিকে ভিন্ন কাব্যধারায় প্রতিষ্ঠিত করে দেখাতেন তাঁকে। কবির সঙ্গে মাঝে মধ্যে কল্পিতার কবির লড়াই চলত। তাঁর গদ্য রচনাতে দেখা যায় 'লিপিকা'র বিশিষ্ট ভঙ্গি। 'নটী', 'মেজবৌ', '১৭ই ফাল্গুন', 'সিনতলা দুর্গ' সবই ওই একই সুরে বাঁধা। উন্মুক্ত প্রাণের কবি সর্বরূপ থেকেই সৌন্দর্য আহরণ করতে ভালবাসতেন। প্রতিমা দেবীর 'স্বপ্নবিলাসী' পড়ে কবি মুগ্ধ হয়ে লিখলেন 'মন্দিরার উক্তি'। এবার কবি তাঁকে 'নরেশের উক্তি' লিখতে অনুরোধ করলেন। অর্থাৎ 'নারীর উক্তি' লিখবেন প্রতিমা ও তিনি লিখবেন 'পুরুষের উক্তি'। কিন্তু বাবামশাইয়ের সঙ্গে গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় নামা...? না, 'কল্পিতা দেবী'ই এবার রণে ভঙ্গ দিলেন!

ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের হাতে লিখিত হয়েছে বহু আত্মজীবনী। প্রতিমা দেবীও তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন 'স্মৃতিচিত্র' নাম দিয়ে, কিছুটা তাঁর মায়ের ডায়েরি 'কাহিনী'র অনুসরণে। তাইতে লিখেছেন দোল দুর্গোৎসব দিয়ে ঘেরা, সাবেকি হিন্দু সংস্কৃতি দিয়ে সাজানো এক ভিন্ন ঠাকুরবাড়ির কথা—যেখানে কেটেছিল তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলো।

রবীন্দ্রনাথের এই গুণবতী পুত্রবধূর সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে শান্তিনিকেতনের নৃত্য-শিক্ষার ইতিহাসে। সেযুগের পর্দানশিন মেয়েদের নাচের কথা চিন্তা করাও ছিল লজ্জাকর ও অসম্ভব। তাই তখন 'বাল্মিকীপ্রতিভা' ইত্যাদির মতো গীতিনাট্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অল্প হাতনাড়া ব্যতীত অন্য কিছুই হত না। প্রতিমা দেবী সাহসিনী হয়ে প্রথম রবীন্দ্রকাব্যে নৃত্যের সূচনা করালেন। তিনি নিজে খুব কমই মঞ্চে উঠতেন। নেপথ্যে থেকে পরিচালনা করতেন সব কিছু। তিনিই নৃত্যনাট্য লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ইচ্ছায় কবি 'পরিশোধ'কে দিয়েছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা'র রূপ। যে-সমাজে মেয়েদের নাচ সম্পূর্ণ গর্হিত, সে-সমাজে রবীন্দ্রনৃত্যশিক্ষার ভার নিলেন প্রতিমা। তিনি নিজে কোনওদিন নাচ শেখেননি। তবু শুরু হল তাঁর রবীন্দ্রনৃত্যকলাকে কেন্দ্র করে গভীর চিন্তাভাবনা ও দুরূহ সাধনা। ইতিমধ্যে ছাত্রী রেবা রায়ের স্বতস্ফূর্ত নৃত্যে, সৌমেন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তিনকন্যার নাচে এবং তারও কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'-র মঞ্চস্থতায় কেশব সেনের নাতনিদের নৃত্য পরিবেশনায় ভদ্রঘরের মেয়েদের নাচের পথটি কিছুটা মসৃণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু সবার পিছনে প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রকাব্যের ভাবনৃত্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে চলেছিলেন একভাবে। ইতিমধ্যে তিনিই রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে 'পূজারিণী'র নৃত্যরূপ 'নটীর পূজা' লিখিয়েছিলেন ও দিনরাত পরিশ্রম করে মেয়েদের শিখিয়ে তা মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন কবির জন্মদিনে। দীর্ঘ চোদ্দো

বছর চিন্তাভাবনা করে তিনি রবীন্দ্রনৃত্যের পাকা রূপটি ফুটিয়ে তুললেন 'চিত্রাঙ্গদা'য়। ১৯৩৬ সালে 'চিত্রাঙ্গদা' প্রথম মঞ্চস্থ হল কলকাতার নিউ এম্পায়ারে। ১৯৪০-এর মধ্যে তার শো হল চল্লিশবার। নেপথ্যে থেকে তার সাজ-সজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, বিশেষত নারীচরিত্রগুলির সুরুচিপূর্ণ রূপসজ্জা—সবকিছুর পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করতেন প্রতিমা দেবী। রবীন্দ্রনৃত্যের পরিবেশনায় তিনি একটি শালীন সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং সেটিকে কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এক্ষেত্রে তাই আজও তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনৃত্য নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন তিনি। তাঁর সুনিশ্চিত মতামতের বিশদ ব্যাখ্যা মেলে তাঁর 'নৃত্য' নামক গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্রসংগীতের অধিকাংশই যেমন মিশ্ররাগে সৃষ্ট তেমনি মিশ্র নৃত্য দিয়েই পরিপুষ্ট হয়েছে রবীন্দ্রনৃত্যের সম্ভার। কবিকে দিয়ে প্রতিমা দেবী লেখাতেন, সমস্তকিছু তৈরি করে কবিকে দেখাতেন ও তাঁর অনুমোদন না পাওয়া অবধি সন্তুষ্ট হতেন না। চলত বিরামহীন অনুশীলন। প্রতিমা নিজেই নাচের মুদ্রা দেখিয়ে দিতেন। ছাত্রীদের সেসব মুদ্রা লিখে রাখতে বলতেন, কলাভবনের ছাত্রদের দিয়ে আঁকিয়ে রাখতে তৎপর হতেন সেইসকল মুদ্রা। এইভাবে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতিষ্ঠিত করল রবীন্দ্রনৃত্যকে বাংলার মঞ্চে, তার অনন্য স্বকীয়তা নিয়ে। অমরত্ব পেল নেপথ্যবাসিনী প্রতিমা দেবীর সাধনা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন তাঁর ওপর। দূরে থাকলেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। তাঁকে ৭ মার্চ ১৯২৯-এর একটি পত্রে লিখলেন, ''এতদিনে ওদের নাচ শিক্ষার পালা বোধহয় আবার আরম্ভ হয়েছে। যদি নটীর পূজা ওদের দিয়ে করাতে পারো তো খুব ভালো হয়। রাজা ও রানী আমি তো ছেঁটে ছুঁটে মেজে ঘষে ঠিক করে দিয়ে এলুম, কিরকম অভিনয় হবে জানিনে। কিন্তু আমি যদি এটাকে তৈরি করবার ব্যাপারে হাত দিতে পারতুম তাহলে এটা খুব ভালো হত। ফিরে গিয়ে যদি সুযোগ হয় দেখা যাবে।"[১৭]

শান্তিনিকেতনে আরও একটি অভিনব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল প্রতিমা দেবীর হাত ধরে, গুরুদেবের ইচ্ছাপূরণের দাবি নিয়ে—যার নাম 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'। পরিণত বয়সে যখন তিনি উত্তরায়ণের কোণের 'কোণার্ক' বাড়িটিতে বাস করতেন তখন অমিয়া ঠাকুর এসেছিলেন তাঁর কাছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন আলাপিনীর প্রারম্ভিক দিনের কথা। অমিয়া দেবীর ভাষায়, ''আলাপিনী-মহিলা-সমিতির আদি কথা জানতে চাওয়ায় শুনি—প্রতিমাদি যখন নববধূরূপে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করেন তার কিছুকাল পরে তাঁরই উৎসাহে ও উদ্যোগে এই সমিতির প্রথম আরম্ভ। নামকরণ করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। তিনি এ কাজে প্রতিমাদিকে খুবই উৎসাহ দিতেন, কারণ তিনি চাইতেন যে, এখানকার প্রত্যেকেই আশ্রম ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নতিবিধানে কিছু করুক। প্রতিমাদিই এখানে প্রথম মেয়েদের আনন্দমেলার প্রবর্তন করেন।"[১৮] জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আলাপিনীর যুগ্ম সভানেত্রী আর তার অনন্ত শুভার্থিনী!

আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ হেন ব্যক্তিত্বের স্নেহধন্যা ও মনের মতন মানুষ ছিলেন প্রতিমা দেবী। ছিলেন তাঁর শেষ বয়সের আশ্রয় ও সঙ্গী। পরের দিকে তিনি তাঁকে 'বউমা' না বলে 'মা-মণি' বলে ডাকতেন। অমিয়া দেবী জানাচ্ছেন যে যাঁরাই গুরুদেবের মুখে সে-ডাক শুনেছেন তাঁরাই বলেছেন—এ-ডাকে যেমন মধু ঝরে পড়ত তেমনি ফুটে উঠত এক পরম নির্ভরতার অকথিত বাণী। পুত্রবধূ ও শ্বশুরের সম্বন্ধটি যেন গড়ে উঠেছিল

মধুরতার এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে। অমিয়া দেবী বলেছেন, তিনি এ-প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ঘটনার কথা পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কোনও শহরে সংবর্ধিত হতে চলেছিলেন। ট্রেনের পাশের কামরায় ছিলেন প্রতিমা দেবী ও অন্যান্যরা। স্টেশনে ট্রেন থামতেই রবীন্দ্রনাথকে ট্রেন থেকে নামিয়ে মালায় ভরে দিল সকলে। হঠাৎ তিনি সকলকে সচকিত করে দিয়ে বলে উঠলেন, ''আরে আরে, তোমরা করছ কি? আমাকে তোমরা ফুলের মালায় ঢেকে ফেলছ, আর পাশের কামরায় যে আমার 'ব্রাইড-মাদার' রয়েছেন। যাও যাও—আগে তাঁকে নামাও!''[১৯]

অমিয়া দেবী 'ব্রাইড মাদার' শব্দটির অর্থ বুঝেছিলেন প্রতিমা দেবীর কাছেই। তিনি লিখেছেন, ''গুরুদেব বিদেশের গুণীসমাজে প্রতিমা দেবীকে পরিচিত করিয়ে বলতেন—'আমার বৌমা'। তারপর ব্যাখ্যা করে 'ডটার-ইন-ল' অর্থবোধক বাংলা 'বৌমা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ বলতেন—'ব্রাইড-মাদার!''[২০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতি প্রিয় ছেলে-বউমাকে নিয়ে বহু দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। আগলেছেন তাঁকে কন্যার মতো। থেকেছেন তাঁর পীড়ায় উদ্বিগ্ন। ইউরোপ ভ্রমণকালে একবার প্রতিমা দেবীর অস্ত্রোপচার হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র থাকায় সেকথা জানতেন না, কারণ রথীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম বা চিঠি কোনওটাই তিনি পাননি। সংবাদ জানবার পরে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত কর্মসূচি, এমনকী একটি বক্তৃতার আমন্ত্রণও বাতিল করে লন্ডনে চলে আসেন। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''When we went back to Paris afterwards we had to give explanations to thousands of people.''[২১]

প্রতিমা দেবীর সঙ্গে তাঁর স্নেহের বন্ধনটি ছিল আপনবোধে মোড়া, চরম নির্ভরশীল ও কৌতুকে রঙিন! ১ আগস্ট ১৯২৮-এর এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে লিখছেন, ''...আর যাই বলো, তোমার ঘরে মশা আছে, এমনকী, দিনের বেলাতেও—তাই নিয়ে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়—এইমাত্র flytox ছিটিয়ে গেল—তাতে মশারা মিনিট দশেকের জন্যে কিছু দুঃখিত থাকে, তার পরে সামলিয়ে নেয়।...''[২২] প্রতিমা দেবী নিজে স্বীকার করতেন সেকথা। বলতেন, ''বাবামশায় সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে খুব ভালোবাসতেন। মেয়ে, বউ, পরিবারবর্গের সকলের সঙ্গে, এমনকী, নীলমণি ভৃত্যের সঙ্গেও হাস্যপরিহাসে তাঁর ছিল সহজ আনন্দ। এই চিঠির মধ্যে তার পরিচয় আছে যথেষ্ট। যখন থেকে তিনি বৈষয়িক সংস্রব ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন থেকে কোনওদিন তাঁকে টাকা হাতে রাখতে দেখিনি। যদি কখনো কেউ কিছু প্রণামী দিয়ে যেত তখনই আমাকে ডেকে বলতেন, 'তোমার ব্যাঙ্কে এটা জমা রাখো।'...''[২৩] মংপুতে যাওয়ার পথে, ১৯৪০ সালে, প্রতিমা দেবী গুরুদেবের যে-চিঠিখানি পেয়েছিলেন, তাতে ছিল সেই কৌতুকের লহরী। তিনি লিখেছিলেন,

''মংপুতে যাবার পূর্বে একটা কথা বলে রাখা ভালো। আহার্যের খরচ সম্প্রতি বেড়ে গেছে। শাকপাতা খাচ্ছিলুম, অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে মাছ-মাংস ধরতে হয়েছে। আমার সম্বলের মধ্যে শুনছি তোমার কাছে টাকা দশেক প্রচ্ছন্ন আছে। সেটাতে কদিন চলবে জানিয়ো—সেই অনুসারে ওখানকার মেয়াদ স্থির করতে হবে।...''[২৪]

প্রতিমা দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালবাসা ও ভরসা—উভয়ত ছিল অপরিসীম। পদে পদে তার আভাস মেলে। নিঃসন্তান প্রতিমা দেবীর দত্তক নেওয়া কন্যা পুপে (নন্দিনী)-কেও কবি অত্যধিক স্নেহ করতেন। নানাভাবে খুনসুটি করতেন তাঁর আদরিনি নাতনির সঙ্গে। ২০ মে ১৯২৪-এ পেকিং থেকে প্রতিমা দেবীকে লিখিত এক পত্রে তার কথা লিখেছেন—

''...পুপের কথা লিখে আমাকে লোভ দেখাও কেন বৌমা? তুমি মনে মনে জান ঐ কন্যাটি আমাকে মোহপাশে বেঁধেচে। ঐ মায়াবিনী মরীচিকার মত আমাকে ভোলায় কিন্তু আমাকে ধরা দেয় না। এম্‌নি করে ফাঁকি দিয়ে ও আমার কাছ থেকে কেবল গান আদায় করে। এত অল্প বয়সে ওর এমন সর্বনেশে বুদ্ধি হল কি করে? ও কেমন করে জান্‌লে কবির কাছ থেকে গান আদায় করবার এই একমাত্র উপায়—দুঃখ না দিলে ফাঁকি না দিলে বাঁশি ডাক দিতে চায় না। তুমি লিখেচ, দাদার গান ছাড়া আর কারও গান ওর পছন্দ হয় না, ও আমি কিছু বিশ্বাস করিনে। ও যদি স্বয়ম্বরা হয়, ওর দাদার গলায় মালা দেবে না সে আমি নিশ্চয় জানি।...''[২৫]

ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন জাতির প্রতিভাসম্পন্ন এই মানুষটিকে তাঁর নিকটজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চিনতেন যিনি, তিনি ছিলেন প্রতিমা দেবী। প্রিয় পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর আদর্শগত মতবিরোধ হত, কিন্তু প্রতিমার সঙ্গে নয়। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-সৃষ্টির জগতকে সুষমামণ্ডিত করে তাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করতে যত্নশীল হয়েছিলেন প্রতিমা। গুরুদেবের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে জীবনপাত করেছিলেন। তাই তাঁর লিখিত নৃত্য, চিত্রলেখা, স্মৃতিচিত্র, নির্বাণ নামক চারটি গ্রন্থের মধ্যে 'নির্বাণ' গ্রন্থটি অনন্যসাধারণ—যাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর বাবামশায়ের শেষ এক বছরের অবসান কালের এক হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা।

এই গ্রন্থে ধরা পড়েছে অনেক কিছু। প্রতিমা দেবীর তাঁর বাবামশায়ের প্রতি যত্ন, উৎকণ্ঠা ও গভীর ভালবাসা আর বাবামশায়ের তাঁর স্নেহের মা-মণির প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা। চিঠিতে লিখছেন, ''...তুমি কবে এসে আমাদের ভার গ্রহণ করবে সেজন্যে তাকিয়ে আছি।

ইতি ২২ অক্টোবর, ১৯৩৫

বাবামশায়।''[২৬]

পুত্রবধূ হয়ে এসে থেকে চিরকাল সুখে-দুঃখে ছায়ার মতন পাশে ছিলেন যিনি, তাঁকে শেষ সময়ের রোগশয্যায় যেন ছোট শিশুর মতন আঁকড়ে ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রতিমা দেবী লিখছেন, ''আজকাল বিকেলে চায়ের পর গৌরীপুর -ভবনের লম্বা বারান্ডায় আমার হাত ধরে বেড়ান, বলেন, 'বউমা, আমার একটু বেড়ানো দরকার, বসে থেকে-থেকে আমার পা-গুলো অসাড় হয়ে আসছে।'...''[২৭]

রবীন্দ্রনাথ হেন ব্যক্তিত্বের শ্বশুরমশাইকে তিলে তিলে জেনেছেন, বুঝেছেন ও আবিষ্কার করেছেন যিনি, সেই প্রতিমা দেবীর ভাষায় অনন্য রূপে ধরা দিয়েছেন কবি—তাঁর শেষযাত্রার কালে! বর্ণিত হয়ে সেটি সঞ্চিত হয়েছে এক অসামান্য দলিলরূপে। জীবনসায়াহ্নে লেখা থামেনি। প্রতিদিনের জ্বর ও শারীরিক অসুস্থতা দমাতে পারেনি রবীন্দ্রসৃষ্টির মন্দাকিনী প্রবাহকে! চির কৌতুকপ্রিয় কবি তাঁর রোগশয্যার বিষণ্ণ ঠাঁইটিকেও করে রেখেছিলেন আনন্দময় ও রসমধুর! প্রতিমা দেবীর অসামান্য বর্ণনায় :

''এই নয় মাসে ধীরে-ধীরে চেহারা বদলে গিয়েছিল, তিনি শীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু তাতে তাঁকে ব্যাধিগ্রস্ত দেখাত না, তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা একটি করুণায় পূর্ণ হয়েছিল, তাঁকে ইদানীং মনে হত তপঃক্লিষ্ট ঋষি, আধ্যাত্মিক জ্যোতির মধ্যে দিয়ে চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে, মুখে ঠিকরে পড়ত একটি প্রীতি ও শান্তির ধারা। বড়ো চুল আর রাখতে চাইতেন না বলে রুপোলি কেশগুচ্ছ কেটে দিতে হয়েছিল, চুল ছাঁটাতে প্রশস্ত কপালের গঠন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, নাসার উপর দিয়ে অর্ধাস্যের রেখায় দার্শনিকের ছবি ফুটিয়ে তুলত। রোগশয্যায় কবির চেয়ে তাঁকে আজকাল একজন সাধক দার্শনিক বলেই মনে হত।''[২৮]

চিরদিন পাশে পাশে থেকেছেন যিনি, সেই

আদরের মা-মণি ২৫ জুলাই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় তাঁর শেষযাত্রায় অনুসরণকারিণী হতে পারলেন না। তাঁকে ধরল হঠাৎ কঠিন ব্রঙ্কাইটিস ও জ্বরে। শান্তিনিকেতনের ঘরে শুয়ে কানে আসতে লাগল তাঁর যাত্রার তোড়জোড় ও কোলাহল। এমন সময় কন্যা নন্দিতা একটি জন্মদিনের বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকা এনে তাঁকে দিয়ে বলল, ''দাদামশাই তোমাকে এই বইখানা দিলেন।'' ভিতরের মলাটে তাঁর কাঁপা হাতের অক্ষরে লেখা, ''মা-মণিকে, বাবামণি।''[২৯] আনন্দে আবেগে তিনি সেটি মাথায় স্পর্শ করে বালিশের তলায় রাখলেন। বুঝলেন না যে বিদায়লগ্নে দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ আশিসটুকু—ওই দুখানি শব্দের মধ্য দিয়ে।

চলে গেলেন তিনি—পিতা হয়ে, গুরু হয়ে, সখা হয়ে চিরদিন যিনি পাশে ছিলেন। যাওয়ার বেলা তাঁর চরণটুকুও স্পর্শ করা হল না, নেওয়া হল না আশীর্বাদ। তাই প্রতিমা দেবী প্রণাম জানিয়ে একখানি পত্র লিখলেন গুরুদেবকে, তাতে জানালেন আক্ষেপ—তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়ার। উত্তরের আশাও তিনি করেননি, কিন্তু উত্তর এল আশাতীত-ভাবে। অপারেশনে যাওয়ার আধঘণ্টা আগে রবীন্দ্রনাথ রানী চন্দকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন পত্রখানি, স্খলিত হস্তে কোনওরকমে কলম ধরে স্বাক্ষর করেছিলেন 'বাবামশায়'! সীমাহীন লেখনীর স্ফুরণ ছুটেছিল যাঁর মসির আঁচড়ে, তাঁর হাতে লিখিত এইটিই শেষ শব্দ। লিখলেন,

''মা-মণি,

তোমাকে নিজের হাতে লিখতে পারিনে বলে কিছুতে রুচি হয় না। কেবল খবর নিই আর কল্পনা করি যে তুমি ভালো আছো—অন্তত এখানকার সমস্ত দুশ্চিন্তার ভিতর থেকে দূরে থেকে কিছু আরামে আছো। কিছু তাপ এখনও তোমার শরীরে আছে সেটা ভালো লাগছে না। কেননা ক্ষুদ্র শত্রুর জেদটাই সবচেয়ে দুঃখজনক। আমাকে প্রত্যহই একটা না একটা খোঁচা দিচ্ছেই—বড় খোঁচার ভূমিকা স্বরূপে। শুনেচি বড়র আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়।[,] এইসব ছোট ছোটর উপদ্রব যেমন—যাহোক এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশী দেরী নেই। চুকে গেলে নিশ্চিন্ত থাকব। ইতি

বাবামশায়[৩০]

৩০।৭।৪১

বেলা দশটা, জোড়াসাঁকো

চলে গেলেন প্রতিমা দেবীর 'বাবামশায়', গচ্ছিত রেখে তাঁর সাধের শান্তিনিকেতনকে—

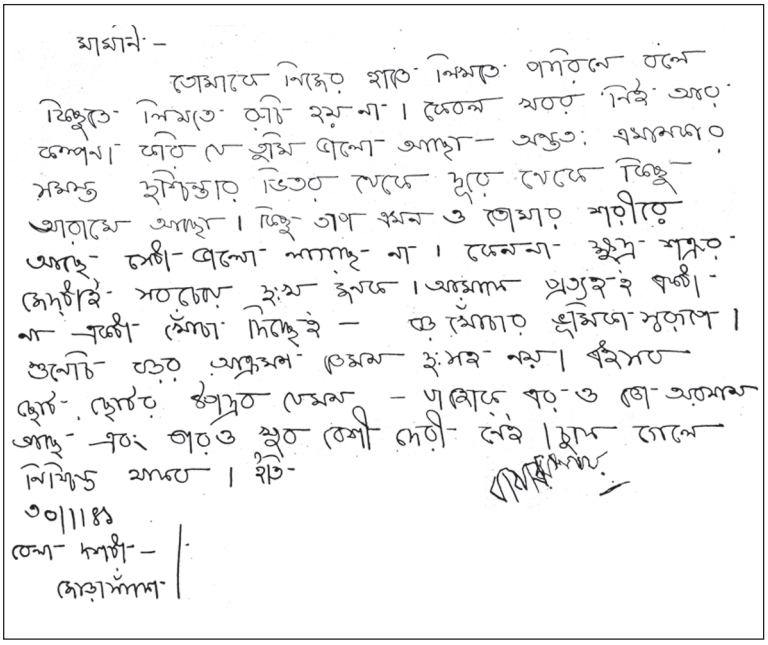

আদরের মা-মণির কাছে। সেই দায়ভার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহন করেছেন তিনি। বাবামশায়ের প্রতি তাঁর হৃদয়ের বিনম্র ভালবাসা নিবেদন করেছেন তাঁর লিখিত 'গুরুদেবের প্রতি' নামক একটি কবিতায়। তার শেষ ছত্রে লিখেছেন—

"...স্নেহের অজস্রতায়
সমাপ্তির শেষ কথা
চিত্তে দিয়ে গেলে ভরে।
সেই নীরব কণ্ঠের বাণীর ইঙ্গিত
পূর্ণ করে থাক্ আমাদের
নিত্য নিবেদনের থালা।"[৩১]

৯ জানুয়ারি ১৯৬৯ নিস্তব্ধ হলেন কবির আদরিনি পুত্রবধূ—শান্তিনিকেতনের 'প্রতিমা বৌঠান'।

সহায়ক গ্রন্থ

১। চিত্রা দেব, *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৯২)
২। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ* (বিশ্বভারতী : কলিকাতা, ১৩৭১)
৩। প্রশান্তকুমার পাল, *রবিজীবনী* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা), খণ্ড ৫ (২০১১), খণ্ড ৬ (২০০৮), খণ্ড ৭ (২০০৭), খণ্ড ৮ (২০০৯), খণ্ড ৯ (২০০৮)
৪। সমীর সেনগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন* (সাহিত্য সংসদ : কলকাতা, ২০১৫)
৫। সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *কল্যাণীয়াসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দশজন নারীকে লেখা শ্রেষ্ঠ পত্রগুচ্ছ* (মিত্র ও ঘোষ : কলকাতা, ১৪১২)
৬। প্রতিমা ঠাকুর, *নির্বাণ* (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : কলিকাতা, ১৩৬২)
৭। প্রতিমা দেবী, *চিত্রলেখা* (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় : কলকাতা, ১৩৫০)

তথ্যসূত্র

১। *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ*, পৃঃ ৭৯
২। *রবিজীবনী*, খণ্ড ৫, পৃঃ ১৪৬
৩। তদেব, খণ্ড ৬, পৃঃ ১১৭
৪। তদেব
৫। তদেব, পৃঃ ১২৩
৬। *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল* , পৃঃ ২১১
৭। *রবিজীবনী*, খণ্ড ৬, পৃঃ ১২৪
৮। *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, পৃঃ ১৬৭
৯। *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ*, পৃঃ ৮৩
১০। *রবিজীবনী*, খণ্ড ৬, পৃঃ ১৮৬
১১। তদেব, পৃঃ ১৬৬
১২। *রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন*, পৃঃ ১৬৯
১৩। *রবিজীবনী*, খণ্ড ৯, পৃঃ ৩
১৪। *ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল*, পৃঃ ২১২
১৫। তদেব
১৬। *কল্যাণীয়াসু*, পৃঃ ৭৭
১৭। তদেব, পৃঃ ৭৮
১৮। *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ*, পৃঃ ৭৯
১৯। তদেব, পৃঃ ৮০
২০। তদেব
২১। *রবিজীবনী*, খণ্ড ৮, পৃঃ ৪৪
২২। *কল্যাণীয়াসু*, পৃঃ ৭৭
২৩। *নির্বাণ*, পৃঃ ২
২৪। তদেব, পৃঃ ৬
২৫। *কল্যাণীয়াসু*, পৃঃ ৬৯
২৬। *নির্বাণ*, পৃঃ ১৫
২৭। তদেব
২৮। তদেব, পৃঃ ৩৫
২৯। তদেব, পৃঃ ৪৯
৩০। তদেব, পৃঃ ৫০
৩১। *চিত্রলেখা*, পৃঃ ৩৯